কল্যাণী

জীবনানন্দ দাশ

ভূমিকা ও সম্পাদনা
গৌতম মিত্র

প্রতিক্ষণ

KALYANI
A Bengali Novel by Jibanananda Das
Edited By Gautam Mitra

First Punascha Edition
January, 2026

ISBN 978-81-7332-388-1

Price r 225

প্রথম পুনশ্চ সংস্করণ
জানুয়ারি, ২০২৬

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
আর্ট ক্রিয়েশন

দাম r ২২৫

পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০ থেকে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং শিবানী প্রিন্টিং ১৭এ, স্যার গুরুদাস রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত। ফোন -৮৯১০২৮৩৪৪৮
Email: punaschabooks@gmail.com
Web: www.punaschabooks.com

ভূমিকা

নিজের সময় থেকে অনেকটাই এগিয়ে ছিলেন জীবনানন্দ দাশ। আমি আমার সমস্ত লেখায় বারবার এই কথাটাই বলতে চেয়েছি। বাংলা ভাষার প্রথম আভাঁ-গার্দ লেখক জীবনানন্দ দাশ।

তাঁর 'কল্যাণী' উপন্যাসে খুব সন্তর্পণে একটি বড়ো বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন জীবনানন্দ দাশ। লেসবিয়ানিজম সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা খুব স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বাংলা সাহিত্যে এর আগে এই বিষয়ে লেখা কোনও গল্প-উপন্যাস আমার অন্তত চোখে পড়েনি। জীবনানন্দ দাশ। 'কল্যাণী' উপন্যাসের নায়িকা কল্যাণীর বাবা যখন কল্যাণীকে বলে, 'কোন মেয়ে তোমাকে চুমো দিল তাই নিয়ে তুমি কবিতা করতে আরম্ভ করলে।' তখন ইঙ্গিতটি আমাদের কাছে অস্পষ্ট থাকে না।

তার আগে দেখি মেয়েদের বোর্ডিঙে কল্যাণীর স্বাধীন আনন্দোচ্ছল জীবন। কোনও মেয়ে তাকে পড়তে দিচ্ছে 'রেড লিলি' আবার কোনও মেয়ে 'অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড'। আর সেই বিশেষ মেয়েটি কল্যাণীকে পড়তে দেয় বার্নাড শ'র 'Intelligent Woman's Pride'! নায়িকা বইটির গন্ধ শোঁকে। শুধু গন্ধ তো নয়।বইটির মধ্যে যে সেই বিশেষ মেয়েটির ''নোট''ও আছে। অনেক বই ঘেঁটে অনেক বিদ্যাবুদ্ধি খরচ করে মেয়েটি যে নোট লিখেছে!

মেয়েটির কথা বলতে গিয়ে মাকড়সার প্রসঙ্গ এসেছে। ইঙ্গিত তো আরও আছেলদুটি মেয়ের কথোপকথনে

' —পড়ব না আজ আর?

—না

—তুমি?
—আমিও না।...
—তোর টিকালো নাক কার কাছ থেকে পেয়েছিস
— তোর মার কছ থেকে?
—বাবার কাছ থেকে।
—এই চোখ?
—বাবার কাছ থেকে।
—এমন সুন্দর থুতনি?
—বাবার কাছ থেকে।...
এসব প্রশ্নের গুখখুরি বুঝল সে। কাজেই আর নয়—ওর মুখের অনুপম রূপসৃষ্টির দিকে তাকিয়েই রইল সে।
ওর নিশ্বাস থেকে কেমন যেন মিষ্টি ঘ্রাণ আসছে।
—কি খেয়েছিস রে?
—কখন?
—মুখ থেকে তোর কিসের গন্ধ আসে?
—জানি না তো।
—জনিস না? সব সময়ই আমি পাই।
—কিসের গন্ধ রে?
মেয়েটি উত্তর দিল না। সৌন্দর্য্যের রসের থেকেই এ যেন এক ঘ্রাণ। পদ্মের রক্তমাংস থেকে যেমন গভীর বিলাসের গন্ধ আসে তেমন। পদ্ম কি কিছু খায়?
একটা চুমো খাই তোকে?
চুমো সে খেল।
এমন পরিতৃপ্তি জীবনে সে কোনো দিনও পায়নি যেন।'
আমরা অন্যত্র জীবনানন্দর কবিতায় দুটো মেয়ের চপ্পল বদলের কথা পড়েছি। জীবনানন্দ নিশ্চয় সাফো পড়েছেন।পড়েছেন ডি.এইচ.লরেন্সের লেসবিয়ানিজম নিয়ে বিখ্যাত 'ফক্স' গল্পটি। এমনকি ১৯৩৩-এর আগে লেসবিয়ানিজম নিয়ে চিন্তাচর্চাও নিশ্চয় জীবনানন্দর অজানা নয়।
কবিতায় দেখি

'শহরের পথে দুটি মেয়েকে দেখলাম
মেয়ে নয়—দুটি মহিলাকে
বরং দুটি জীবনকে দেখলাম
একজনের লাল পেটিকোট তার শাড়ি ছাড়িয়ে
ফুটপাতের কাদা, কফ ও ঘাস ঘষে চলছে
পেটিকোটটা সে নিজেই কোনও কাঁচা রং দিয়ে লাল ক'রে নিয়েছে
হৃদয়ে তার লালরঙের পেটিকোট চায় ব'লে

আর একজন একজোড়া পুরুষের জুতো পায় দিয়েছে
জুতো পায়ে দেবার একান্ত প্রয়োজনে।
তারা যে হেঁটে চলেছে
তাদের অজ্ঞান সাহস ও সুস্থিরতা
পৃথিবীর ব্যথিত জ্ঞানের শিয়রে কোনও স্থিরতা দিল না
তারপর বড়ো রাস্তার ভিড়ের ভিতর হারিয়ে গেল
রাতের ঘুমের গহ্বরের ভিতর
রুগ্ন বিড়ালের ধূসর লেজ যেমন ফুরিয়ে যায়।'

অত্যন্ত ইঙ্গিতপূর্ণ কবিতাটি আমাদের অবাক করে। এনার্কিজম, সুররিয়েলিজম থেকে শুরু করে এমন কোনও সাহিত্য আন্দোলন নেই যা জীবনানন্দকে স্পর্শ করেনি। আবার এই মানুষটাই দ্রোণ ফুল, সুদর্শন বা নিম ফুল নিয়ে কবিতা লিখেছেন। এক সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে যেন জন্মেছিলেন। নিটশে বলেছিলেন 'ওভারম্যান'-এর কথা, জার্মান শব্দ 'উবারমেনশ' থেকে। আমাদের জীবনানন্দ উবারমেনশ। নিটশে তাঁর 'দাস স্পোক জরাথুস্ট' গ্রন্থে 'ওভারম্যান' সম্পর্কে বলেছেন, 'an ideal future human who transcends conventional morality– creates their own values–and overcomes traditional limitations (especially religious ones) to achieve self–mastery and affirm life– acting as a 'bridge' beyond current humanity rather than a final goal.' জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কেও ঠিক এই কথাটিই প্রযোজ্য।

'কল্যাণী' (জুলাই ১৯৩২, কলকাতা) উপন্যাস জীবনানন্দ দাশের প্রথম দিককার রচনা। যে জীবনানন্দ দাশকে আমরা 'কারুবাসনা' ও 'প্রেতিনীর রূপকথা' থেকে 'মাল্যবান' ও 'জলপাইহাটি' অবধি ক্রমশ আবিষ্কার করব সেই লেখক 'কল্যাণী'-তে অনুপস্থিত। খুবই সাধারণ একটা গল্প,তাতে আচম্বিত জীবনানন্দকে খুঁজে পাওয়া গেলেও, সচেতন কোনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা নেই।

শালিখ বাড়ি গ্রামের এক ছোটখাটো জমিদার পঙ্কজ রায়চৌধুরী। সেখানে তার সঙ্গে থাকে স্ত্রী গুণময়ী ও মেজ ছেলে প্রসাদ। বড়ো ছেলে দীর্ঘ দিন ধরে বিলেতে আছে। মেমকে বিয়ে করে বিলেতেই তার স্থায়ী বসবাস। পঙ্কজবাবু একসময় বড়ো ছেলেকে বিলেতে নিয়মিত টাকা পাঠালেও মেজ ছেলের প্ররোচনায় সম্প্রতি তা বন্ধ করেছে। ছোট ছেলে কিশোর ও মেয়ে কল্যাণী কলকাতার বোর্ডিঙে থেকে পড়াশোনা করে। কিশোর খুবই উচ্ছৃঙ্খল, পানাহার ও থিয়েটার-বায়োস্কোপে অতিমাত্রায় আসক্ত।

উপন্যাসের শুরুতে দেখা যায় কল্যানী তার দেশের বাড়িতে ফিরে খুশি নয়। কলকাতার মুক্ত জীবন তার বেশি পছন্দের। বাবাকে লেখা একটি চিঠিতে কল্যাণীর এই মনোভাব ধরা পড়েছে।

'তুমি যদি তাই চাও বাবা তাহ'লে আবার আমি দেশে ফিরে যেতে পারি। তোমার

মনে কষ্ট দেবার আমার একটুও ইচ্ছা নেই। তুমি ভেবেছ তোমাদের চেয়েও কলকাতার ফাইফুর্তি বুছি আমি বেশী ভালোবাসি। তা আমি ভালোবাসি না বাবা। তোমাদেরই আমি বেশি ভালোবাসি-ঢের বেশি। কলকাতার ফুর্তির কোনো মূল্য নেই আমার কাছে এখন আর। এ সব আমার আর ভালো লাগে না।

দেশে থাকতে মুখ ফুটে কিছু বলিনি বলে, বাবা, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। এই চিঠিতে তো আমি সব লিখছি; সব খুলে লিখলাম। এখন তুমি তোমার মেয়েকে ঠিক করে চিনতে পারবে।

ষ্টিমারঘাট থেকে সেই যে তুমি চলে গেলে তখন থেকেই আমার এত খারাপ লাগতে লাগল। আমি রেলিঙে ভর দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু ষ্টিমারটা হঠাৎ কেমন করে যে কোন দিকে যে ঘুরে গেল ভিড়ের ভিতর তোমাকে আমি আর দেখতে পেলাম না-দেখতে দেখতে পথঘাট লোকজন কোথায় সব পড়ে রইল রইল শুধু নদী আর ছোড়দা আর আমি। তখন এমন খারাপ লাগল আমার কি বলব তোমাকে বাবাল অনেকক্ষণ রেলিঙের পাশে দাঁড়িয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে রইলাম।...

কিন্তু কলকাতায় যখন এসেছি পাশ না করে যাব না। মানুষকে তো ভগবান সুখের জন্যই তৈরি করেননি শুধু। তোমাদের কাছে থাকলে বেশ শান্তি পেতাম-সুখ পেতাম কিন্তু তবুও সেটা কুঁড়েমি হ'ত; অকর্মণ্যতা হ'ত; মানুষের জীবনের কর্তব্য তাতে পালন করা হ'ত না।

আমি মেয়ে হয়ে জন্মেছি বটে, কিন্তু তবুও আমার ঢের করবার জিনিষ আছে। প্রথমত আমি লিখতে চাই; পড়াশুনা করে জ্ঞান অর্জন করতে চাই। তুমি বলেছিলে ডিগ্রি নিয়ে কি হবে? হয়তো ডিগ্রির কোনো মুরোদ নেই। কিন্তু তবুও একটার পর একটা ডিগ্রির জন্য এই যে স্কুলকলেজে বছরের পর বছর পড়তে হয় এ জিনিষটা আমাদের একটা নিয়ম শেখায়, একটা শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসে আমাদের, এই শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে আমাদের অন্য নানারকম জিনিষ শিখিয়ে দেয়-যা হয়তো আমরা অন্য কোনো ভাবে আয়ত্ত করতে পারতাম না।

এই দেখ, আমি যদি কলেজ ছেড়ে দিতাম তাহ'লে এই নিয়মের ভিতর থাকতাম না আর; তাতে হত কি জান বাবা? সহিষ্ণুতা ও চেষ্টা করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতাম-মন ক্রমে ক্রমে আরাম আয়েসের দিকে চলে যেত। সে রকম মন নিয়ে শুধু শিক্ষাদীক্ষাই নয়-পৃথিবীর কোনো সার জিনিষই লাভ করতে পারতাম না আমি-পারতাম কি বাবা?

সেই জন্যই আমি সঙ্কল্প করেছি যে কলেজের এই রকম সব কঠিন আইন কানুনের ভিতর অনেকদিন থেকে থেকে আমি নিজেকে ঢালাই পিটাই করে নিয়ে সম্পূর্ণভাবে তৈরি করে নেব।

এখানকার ডিগ্রি নিয়ে তারপর আমি বিলেত যাব।

বিলেত থেকে শিখে এসে তারপর এইখানে মস্ত বড় কাজের জায়গা পাওয়া যাবে, নানারকম কাজের কল্পনা আমি ঠিক করে রেখেছি; ক্রমে ক্রমে সপই সবই আমি সফল করে তুলব।...'

তো এ হেন কল্যাণীর বিয়ে হল কদাকার, লম্পট ও জোচ্চোর চন্দ্রমোহনের সঙ্গে। জীবনানন্দ এখানে খুব বস্তুনিষ্ঠ ভাবে কল্যাণী ও চন্দ্রমোহনের বৈপরীত্যকে বর্ণনা করেছেন। এমনকি কল্যাণীর বেকার প্রেমিক অবিনাশের ভূমিকা আমাদের অস্বস্তিতে ফেলে। অবিনাশও কল্যাণীকে চন্দ্রমোহনকে বিয়ে করার পরামর্শ দেয়।

উপন্যাসের পরিণতি খুবই ভয়ঙ্কর। এতটাই পরিণামহীন উদগ্র যে সহ্য করা কঠিন। উপন্যাসটি শেষ হচ্ছে এইভাবে

(কল্যাণীর) ছেলেই হ'ল—

যেই দেখে সেই বলে ''একি, এ যে আর এক চন্দ্রমোহন এল—''

ঠিক তেমনি বাঁদরের মত মুখ, হলদে রং, চোখ পিটপিট করছে-ভুরু দুটো রোঁয়ায় ভরা-মুখের ভিতর কেমন একটা নির্মম ধাপ্পাবাজির ইসারা-তারপর কেমন একটা নিঃসহায়তা—

কিন্তু কল্যাণীর চোখে এ সব কিছুই ধরা পড়ে না। সুস্থ সন্তানকে মাই খাইয়ে নিজের বুকের ভিতর জড়িয়ে এমন ভালো লাগে তার। এন্নি করে মাস আষ্টেক কেটে গেল—ছেলের দাদা দিদিমা কেউ তাকে দেখতে এল না; কল্যাণীরও দেশে যাওয়া হ'ল না। চিঠিও সে আর পায় না কারু লেখেও না কাউকে।

একদিন দুপুরবেলা চন্দ্রমোহন দেখল যে কল্যাণী ঘুমুচ্ছে-সমস্ত শরীরের জামা কাপড় সবই প্রায় খোলা— ছেলেটিকে মাই দিতে দিতে কি এক রকম আদরে ও পিপাসায় নিজের শরীরের সাথে ছেলের শরীর একেবারে মিশিয়ে ফেলেছে যেন সে —মিশ্রণ ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছুই যেন চায় না কল্যাণী—জিনিষটাকে সোজাসুজি বুঝতে পারল না চন্দ্রমোহন। উদ্ভট ভাবে ভাবলে—এই ছেলেটা তো সে নিজেই-দিকবালিকারা মাথা নেড়ে নেড়ে বল্লে-তুমিই তো

এই স্বর্গসম্ভবা কল্যাণীর মত মেয়ের জীবনেরও এক বিরাট উচ্ছৃঙ্খলতা—উপহাস, নোংরামি, অধঃপতন, ও নিজের মনের এক অপরিসীম লালসার রসে মন তার উত্তেজিত হয়ে উঠল।

কিন্তু সম্প্রতি উপায় নেই—রাত্রে হবে।

কল্যাণী আবার আটমাস—আর এক চন্দ্রমোহন আসছে।

(গভীর পরাক্রমের সঙ্গে আপাততঃ নিজেকে সংযত করে নিয়ে চন্দ্রমোহন বেরিয়ে গেল।)'

উপন্যাসটি ১৯৩২-এ লেখা হলেও প্রকাশিত হয়েছে প্রায় ছেষট্টি বছর পর 'দেশ' (১৯৯৮) পত্রিকার একটি সংখ্যায়। সেখানে ভূমেন্দ্র গুহর মুখবন্ধটি খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এখানে তুলে দিলাম—

অনবধানতাবশত জীবনানন্দের যে-কয়েকটি পূর্ণ-অপূর্ণ উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির খাতা জাতীয় গ্রন্থাগারে জমা পড়েনি, তাঁর তথাকথিত অসূর্যম্পশ্য 'লিটারারি নোটস'-এর খাতাগুলির সঙ্গে মিলে-মিশে ব্যক্তিগত সংগ্রহে থেকে গিয়েছিল, 'কল্যাণী' উপন্যাসটি তাদের অন্যতম মুখ্য চরিত্রের নামে উপন্যাসটির নামকরণ করা হয়েছে, জীবনানন্দ নিজে কোনও নামকরণ করেননি।

উপন্যাসটির রচনাকাল পাণ্ডুলিপির খাতার সূচনাপত্রের সাক্ষ্য অনুসারে জুলাই ১৯৩২; স্থান, যদিও কোথাও উল্লিখিত হয়নি, ধরে নেওয়া যেতে পারে বরিশাল, কেন না খাতাগুলির মলাটে মুদ্রিত আছে— বরিশাল।

'কম্পানিয়ন', 'সোয়ান ব্র্যান্ড' এবং 'সোয়ান'—তিনটি ভিন্ন ব্র্যান্ডের রুলটানা একসারসাইজ খাতার প্রতিটির সূচনাপৃষ্ঠায় ইংরেজিতে লেখা আছে যথাক্রমে A Novel-I, A Novel-II এবং A Novel-III; এই সব পৃষ্ঠাতেই Jibanananda Das, July 1932 কথা ক'টিও লেখা আছে।

পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাঙ্ক যথাক্রমে প্রথম খাতায় ১ থেকে ৮৭, দ্বিতীয়টিতে ৮৮ থেকে ১৬৯ এবং তৃতীয়টিতে ১৭০ থেকে ২০২। পাণ্ডুলিপিটি ২০টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত।

পাণ্ডুলিপিবদ্ধ উপন্যাসটি যে সম্পূর্ণ তাতে সন্দেহ করা চলে না, কেননা, উপন্যাসের ২০ তম পরিচ্ছেদটি লেখা শেষ করার পরে (পৃ. ১৯৩) তিনি ১৯-সংখ্যক পরিচ্ছেদটি লিখেছেন— এই মর্মে পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠাঙ্ক ১৯৪-র উপরে ইংরেজিতে লিখেছেন : N.B.(An intervening chapter : Last But One). এই পরিচ্ছেদটি শেষ হয়েছে ২০২ পৃষ্ঠায়। তবে মুদ্রণের সময় উপরিউক্ত সূত্র ধরে এবং ধারাবাহিকতার স্বার্থ মান্য করে ১৯-সংখ্যক পরিচ্ছেদটি যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপিতে স্বাভাবিক ভাবেই কাটাকুটি আছে, গ্রহণ-বর্জন আছে এবং বিকল্পসন্ধানও আছে : পত্রিকায় মুদ্রণের সময়ে এই সব জটিলতা উহ্য রাখা হল

প্রকাশক সন্দীপ নায়কের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এই বই প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। জীবনানন্দ দাশের সমস্ত রচনা একে একে প্রকাশ করার ব্রত নিয়ে তিনি মহৎ একটি কাজ করছেন।

উপন্যাসগুলিতে আধুনিক বানানবিধি অনুসরণ করা হয়েছে; বিকল্প পাঠের ক্ষেত্রে আমরা জীবনানন্দ দাশের জীবৎকালে পাণ্ডুলিপি থেকে মুদ্রিত পাঠের ক্ষেত্রে স্বয়ং লেখক যে রীতি অনুসরণ করেছেন তা গ্রহণ করেছি।

০৮.০১.২০২৬ গৌতম মিত্র

রায়চৌধুরীমশাই নানারকম কথা ভাবছিলেন। প্রথমত জমিদারিটা কোর্ট অব ওয়ার্ডসে দিলে কেমন হয়?

ভাবতে গিয়ে তিনি শিহরিত হয়ে উঠলেন। অবস্থাটা অত খারাপ হয়নি।

কোনওদিনও যেন না হয় ওরকম অবস্থা!

কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কথা তিনি ভুলে যেতে চাইলেন।

হাতের চুরুটটা নিভে গিয়েছিল—

রায়চৌধুরীমশাই জ্বালিয়ে নিলেন।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। শালিখবাড়ির নদীর পাশে তার দরদালানটা—রায়চৌধুরীদের তেতলা জমিদারবাড়ি; সেই ক্লাইভের আমলে তৈরি আধ-ইংরেজি আধ-মুসলমানি ধরনে একটা মস্ত বড়ো ধূসর পুরীর মতো; চারদিককার আকাশ মাঠ ধানের খেত, নদী, নদীর বাঁক, খাঁড়ি, মোহানা, চরগুলোকে উপভোগ করবার এমন একটা গভীর সহায়তা করছে—দৈত্যরাজের উঁচু কাঁধের মতো এই প্রগাঢ় বাড়িখানা।

তেতলার পশ্চিম দিকে বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে চৌধুরীমশাই দেখছিলেন সব—উত্তর দিকে ন্যাওতার মাঠ—ধু ধু করে অনেক দূরে ভিলুন্দির জঙ্গলে গিয়ে মিশেছে। এই মাঠে কত কী যে ব্যাপার কতবার হয়ে গেল—নিজের চক্ষেও চৌধুরী কত কিছু দেখলেন!

তারপর এল শান্তি— মাঠটা স্কুল কলেজের ছেলেদের ফুটবল গ্রাউন্ড হল, কখনও বা মিটিং হয় এখানে, কংগ্রেসের ক্যাম্প বসে, ডিস্ট্রিক্ট টিচারদের, মুসলমানদের, মাহিষ্য নমঃশূদ্রদের কনফারেন্স হয়; বেদিয়ারা আসে, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের আখড়া হয়ে ওঠে।

এই সমস্তই শান্তির (উন্নতি অবসরের) জিনিস। আগেকার অনেক গ্লানি পাপ কলঙ্কের ওপর এগুলো ঢের সান্ত্বনার মতো।

(মাঠটার প্রায় সমস্ত জায়গাই এখন উলুঘাসে ভরে আছে—আর কাশে। কিন্তু ফুটবল খেলা আরম্ভ হবার আগেই মাঠের দক্ষিণ দিকটা বেশ পরিষ্কার করে নেওয়া হবে।)

বর্ষার মুখে শালিখবাড়ির নদীটা পেটোয়া হয়ে উঠেছে।

ইলিশ মাছের জালে জালে নদীটা ভরে গেছে; পশ্চিম মুখে নদীর কোলঘেঁষা একটা সরু লাল রাস্তার দিকে তাকালেন চৌধুরী—বিশ-পঞ্চাশটা ইলিশের নৌকা জমা হয়ে গেছে ওখানে—আধ ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত টাউনটার নাড়িনক্ষত্রে ইলিশের চালান শুরু হবে।

কুড়ি-পঁচিশটা স্টিমার তিন-চারটা বড়ো বড়ো জেটির কিনার ঘেঁষে নদীর (ঘাটের কাছাকাছি) ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে; দু-একটা কয়লাঘাটার দিকে ধীরে ধীরে যাচ্ছে; সবসময়ই এমনি অনেকগুলো স্টিমার এই ঘাটে মোতায়েন হয়ে থাকে; এখানকার এ স্টিমার স্টেশন এ অঞ্চলে খুব বড়ো।

কলকাতার এক্সপ্রেস স্টিমার ছাড়ল।

চৌধুরীমশায়ের চুরুট জ্বলতে জ্বলতে নিভে গিয়েছে আবার।

জ্বালালেন তিনি।

জমিদারবাড়ির তেতলার কাছের আকাশটা ঘেঁষে কাকগুলো ভিলুন্দির জঙ্গলের দিকে চলল। পশ্চিমের গোলাপি পিঁয়াজি মেঘের ভিতর নলচের মতো কালো কালো ঠোঁট মুখ পাখা নীচে সবুজ নাকি নীল জঙ্গল ধানখেত রুপোর পৈছের মতো নদী—শকুনের মেটে পাখা চিলের সাদা পেট সোনালি ডানা—রাত গাঢ় হয়ে নামবার আগে এইগুলো রঙের খেলা—রসের খেলাও বটে।

কিন্তু দু-এক মুহূর্তের শুধু—

শঙ্খচিলটা অন্তর্হিত হল।

খানিকক্ষণ পরে পৃথিবী একটু চিমসে জ্যোৎস্না জোনাকি আর লক্ষ্মীপ্যাঁচার দেশে এসে হাজির হয়েছে। (মন্দ নয়।) নিভন্ত চুরুটটা আবার জ্বালানো গেল।

চৌধুরী ভাবছিলেন বড়ো ছেলেটা বিলেত থেকে ফিরবে না আর তা হলে? আই-সি-এস পড়তে গিয়েছিল; কিন্তু আই-সি-এস পাশ করবার মতো চোপা তো তার নয়; একটা টেকনিক্যাল কিছু শিখে এলে পারত; কিন্তু তা-ও তো এল না; এই আট বছরের ভিতর ফেরবার নামটি অবধি করছে না; আগে খুলে লিখত টিখত; এখন হদ্দ লুকোচুরি করছে। তাকে আর টাকা পাঠাবেন তিনি?

গুণময়ীর জন্যই—না হলে দু-তিন বছর আগেই তিনি টাকা বন্ধ করে দিতেন। ছেলেটা হয়তো বিলেতে বিয়ে করেছে; তার স্ত্রী ছেলেপুলের ফোটোও নাকি কারও কারও কাছে পাঠায় সে—

না, টাকা আর তাকে পাঠাবেন না তিনি।

ছোটো ছেলেটা হয়েছে কলকাতার এক লজ্জা; অ্যাদ্দিনে বি-এস-সি হয়ে যেত। কিন্তু এখনও সেকেন্ড ইয়ারে রয়েছে; বাপের টাকায় সুখের পায়রার অনেক সুখই মেটাচ্ছে সে—কিন্তু গোলাপের তোড়া হাতে থিয়েটারের গ্রিনরুমে ঢুকে শালিখবাড়ির ছোটো কর্তা না কী... ভাবতে ভাবতে চৌধুরী বেকুব হয়ে পড়লেন।